International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-III, May 2026, Page No. 32-42
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.03W.320

বাংলার ছড়া: লৌকিক বেদ

নয়ন সরকার

স্বাধীন গবেষক, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 26.04.2026; Accepted: 07.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The main aim of this research paper is to evaluate the rich folk tradition of Bengal, 'Chhara', on a higher philosophical and theoretical standard. Just as the 'Vedas' in Indian tradition are an unbroken oral tradition, the folk chhara of Bengal is also an unspoken 'Lokika Vedas' of the collective psyche and history of Bengalis. The present study does not view Chhara as just children's literature, but rather analyzes it in the context of archaic consciousness, social evolution and anthropology. The article explores the primitive pantheism and nature worship hidden deep within the rhymes in the light of Rabindranath Tagore's "Chelevulano Chora" (Child-forgotten Rhymes). It also shows from Dr. Ashutosh Bhattacharya's sociological perspective how historical truths like the Bargi invasion or the oppression of indigo farmers are imprinted in the body of the rhymes. The ethnographic chemistry of Bengali folk rituals, totems, taboos and family relations has been discussed in detail here through the material collected by Dakshinaranjan Mitra Majumdar. The study has also shown that the 'vowel' rhythm and phonetic solemnity of the rhyme possess a hypnotic power similar to that of Vedic mantras, which has been preserved as 'Shruti' from generation to generation. Finally, the survival of this oral tradition and the importance of women's voices in the era of modern globalization are examined in a contemporary context. Overall, this article proves that the folk songs of Bengal are Bengalis' own epistemological document and an eternal cultural legacy.

Keywords: Folklore, Folk Rhymes, Archaic Consciousness, Social Evolution, Anthropological Analysis, Oral Tradition, Rabindranath Tagore, Ashutosh Bhattacharya.

মানব সভ্যতার বিবর্তনের আদিমতম লিপি হলো মানুষের কণ্ঠস্বর। যখন লিখন পদ্ধতি কিংবা মুদ্রণযন্ত্রের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তখন মানুষের লব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতাজাত প্রজ্ঞা এবং হৃদয়ের গহনতম আর্তি অভিব্যক্ত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম ছিল 'ধ্বনি' ও 'শ্রুতি'। আর্য সভ্যতার প্রাজ্ঞ ঋষিরা যেমন তাঁদের আধ্যাত্মিক আরোহণের সারকথা ও মহাজাগতিক বিস্ময়কে উত্তরসূরিদের কানে কানে সঞ্চারিত করেছিলেন—যাকে আমরা 'বেদ' বা 'শ্রুতি' বলে জানি— বাঙালির লোকায়ত জীবনে 'ছড়া' ঠিক সেই প্রকার এক অবিনাশী বাচনিক ঐতিহ্য। ছড়া কেবল শিশুর চিত্তবিনোদনের অসার শব্দক্রীড়া নয়; বরং এটি বাঙালির সহস্র বছরের সামষ্টিক অবচেতনের (Collective Subconscious) এক প্রামাণ্য ও জীবন্ত প্রত্ন-দলিল। ছড়াকে কেন আমরা 'লৌকিক বেদ' বলবো, তার কারণ নিহিত রয়েছে এর তাত্ত্বিক ও গঠনগত কাঠামোর গভীরে। বেদের মন্ত্রগুলো যেমন 'অপৌরুষেয়'— অর্থাৎ যার কোনো একক রচয়িতা নেই— বাংলার লোকছড়াও ঠিক তেমনই কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিনামধারী কবির সৃষ্টি নয়। এটি লোকমানসের এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণ, যা কালের প্রবাহে

শত-সহস্র কণ্ঠের সংযোজন ও বিয়োজনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। বেদের ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণে যেমন এক ধরণের ঐন্দ্রজালিক ধ্বনিমাধুর্য ও নির্দিষ্ট কম্পন বিদ্যমান, বাংলার লোকছড়ার স্বরবৃত্ত ছন্দের হিল্লোলেও ঠিক তেমনই এক আধ্যাত্মিক ও সম্মোহনী শক্তি নিহিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে গেলে, এই ছড়াগুলো যেন 'আমাদের আদিম স্মৃতিখণ্ড'; যা মেঘের মতো নিরন্তর রূপ পরিবর্তন করেও আপন মূল সুরটি অক্ষয় রেখেছে।

নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায়, ছড়া কেবল অলীক কবিকল্পনা নয়, বরং এটি প্রত্ন-চেতনা এবং সমাজ-বিবর্তনের এক বিশ্বস্ত দর্পণ। আদিম মানুষের ভয়, বিস্ময় ও প্রকৃতি-বন্দনা থেকে শুরু করে মধ্যযুগের রাজনৈতিক ডামাডোল, কিংবা ঔপনিবেশিক শাসনের নিগূঢ় সামাজিক প্রভাব— সবই এই লৌকিক শ্রুতিপরম্পরার শরীরে অঙ্কিত হয়ে আছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের মতো গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, ছড়ার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে বাঙালির লৌকিক আচার, ধর্মীয় সংস্কার এবং সাংস্কৃতিক সত্তার নিগূঢ় সংকেত লুকিয়ে আছে। যেখানে প্রথাগত ইতিহাস রাজাবাদশাহদের জয়গান গায়, ছড়া সেখানে সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রাম ও ঐতিহ্যের ইতিহাসকে পরম মমতায় আগলে রাখে। এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট হলো— বাংলার অতি পরিচিত ও লোকশ্রুত ছড়াগুলোর অন্তরালে নিহিত সেই উচ্চতর জীবনদর্শন ও ঐতিহাসিক সত্যকে অন্বেষণ করা। আমরা আলোচনার মাধ্যমে দেখবো, যে ছড়াগুলোকে আমরা সচরাচর অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি, তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাঙালির নিজস্ব 'ঋগ্বেদ' কিংবা 'অথর্ববেদ'-এর লোকায়ত সংস্করণ। এই ছড়াগুলো আসলে শব্দ দিয়ে গড়া এক একটি প্রাচীন মন্দির, যেখানে বাঙালির হাজার বছরের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রাণভোমরাটি আজও স্পন্দিত হচ্ছে।

প্রত্ন-চেতনা বা আদিম চেতনা হলো মানব সভ্যতার সেই শৈশবকাল, যখন যুক্তি নয়, বরং বিস্ময় ছিল জগতকে দেখার প্রধান চশমা। লোকসাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, ছড়া হলো বাঙালির অবচেতন মনের এক অসংলগ্ন কিন্তু শক্তিশালী শিল্পরূপ। আমরা উদাহরণের মাধ্যমে দেখবো কীভাবে ছড়ার পরতে পরতে বাঙালির প্রত্ন-স্মৃতি ও বৈদিক মন্ত্রের আদিম অনুরণন লুকিয়ে আছে।

বৈদিক ঋষিরা যেমন সূর্যকে 'মিত্র' বা ঝড়কে 'মরুৎ' দেবতা হিসেবে কল্পনা করেছিলেন, বাঙালির আদিম মানসও ঠিক তেমনই প্রকৃতির প্রতিটি চলনকে এক একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে দেখেছে। একেই নৃতত্ত্বের ভাষায় বলা হয় 'সর্বপ্রাণবাদ'।

"রোদ হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে, খেঁকশিয়ালের বিয়ে হচ্ছে।"[১]

প্রকৃতির একটি বিশেষ আবহাওয়াজাত বৈচিত্র্যকে অর্থাৎ একই সাথে রোদ ও বৃষ্টি লৌকিক ঐতিহ্যে একটি অতিপ্রাকৃত সামাজিক উৎসবে রূপান্তর করা হয়েছে। এখানে খেঁকশিয়াল কেবল প্রাণী নয়, বরং এক আদিম রূপক। বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ সম্পর্কের বদলে এই যে অলৌকিক আনন্দময় ব্যাখ্যা, এটাই হলো প্রত্ন-চেতনার মূল বৈশিষ্ট্য।

"আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেবো মেপে / লেবু পাতার করমচা, যা বৃষ্টি ধরে যা।"[২]

এটি কেবল শিশুর প্রার্থনা নয়; এটি প্রাগৈতিহাসিক বৃষ্টি আবাহনের এক অবশেষ বা 'Rain-making Ritual'। এখানে 'ধান দেবো মেপে' অংশটি প্রকৃতির সাথে এক ধরণের আদিম চুক্তি বা তান্ত্রিক বিনিময় প্রথার ইঙ্গিত দেয়। বেদের বরুণ সূক্তে যেমন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা হতো, এখানেও ভাষার সারল্যে সেই একই আর্তি ধ্বনিত হয়।

"মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি / আজ আমাদের ছুটি ও ভাই আজ আমাদের ছুটি।"[৩]

এখানে জড় প্রকৃতির ওপর মানবিক আবেগের (হাসি, ছুটি) আরোপ করা হয়েছে। প্রকৃতি যখন মানুষের আনন্দের সঙ্গী হয়ে ওঠে, তখন সেটি আর নিছক আবহাওয়া থাকে না, হয়ে ওঠে এক আধ্যাত্মিক সংযোগ।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে মানুষ যখন মহাবিশ্বের বিশালতার সামনে নিজেকে অসহায় বোধ করেছে, তখন সে চাঁদ, সূর্য বা তারার মতো মহাজাগতিক বস্তুকে পরিবারের সদস্য হিসেবে কল্পনা করে নিজের ভয়কে জয় করেছে।

"আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা / চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।"[৪]

চাঁদকে 'মামা' সম্বোধন করা বাঙালির এক অনন্য নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। এটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপন করে নেওয়ার এক আকুল প্রয়াস। কপালে টিপ দেওয়া আসলে এক ধরণের সুরক্ষামূলক জাদু বা 'Protective Magic', যা শিশুকে অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করে বলে আদিম বিশ্বাস ছিল।

"মাছ কাটলে মুড়ো দেবো, ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো
কালো গোরুর দুধ দেবো, সোনার বাটি ভরিয়ে দেবো।"[৫]

এখানে চাঁদের সাথে যে উপঢৌকনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, তা আদিম শিকারি ও কৃষিভিত্তিক সমাজের 'বিনিময় প্রথা'র প্রতিচ্ছবি। মানুষের এই চিরকালীন স্বভাব—কিছু পাওয়ার আশায় কিছু অর্পণ করা— এখানে স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লক্ষ্য করেছিলেন যে, ছড়া কোনো লজিক বা যুক্তির ধার ধারে না। এর অসংলগ্নতাই এর শক্তি। এই বৈশিষ্ট্যটি বেদের কোনো কোনো গুহ্য মন্ত্রের মতো, যা সাধারণ অর্থে দুর্বোধ্য কিন্তু গভীর ব্যঞ্জনাময়।

"আয় রে আয় টিয়ে, নায়ে ভরা দিয়ে / না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে, তাই দেখে দেখে কোলাব্যাঙ নাচে।"[৬]

টিয়ে পাখির নৌকা চালানো, বোয়াল মাছের সেই নৌকা হরণ এবং কোলাব্যাঙের নাচ—এই সম্পূর্ণ চিত্রটি একটি পরাবাস্তব জগত তৈরি করে। আদিম মানুষের কাছে পশু, পাখি এবং মানুষের সীমানা ছিল খুব অস্পষ্ট; এই ছড়াটি সেই সীমানা ভাঙার এক প্রত্ন-স্মৃতি।

"হাঁট্টিমা টিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম / তাদের খাড়া দুটো শিং, তারা হাঁট্টিমা টিম টিম।"[৭]

এটি এক সম্পূর্ণ কাল্পনিক সত্তার আবাহন। আদিম যুগের গুহাচিত্রগুলোতে যেমন অদ্ভূত প্রাণীর ছবি পাওয়া যায়, এই ছড়াটি সেই হারিয়ে যাওয়া কল্পনাশক্তির বাচনিক উত্তরাধিকার।

অনেক সময় ছড়ার অর্থ বোঝা যায় না, কিন্তু তার সুর ও তালের ঝংকার মনে এক অদ্ভুত শিহরণ তৈরি করে। বেদের মন্ত্রোচ্চারণের মতো এখানেও 'ধ্বনি'ই প্রধান।

"ইকির মিকির চাম চিকির / চামের কাটা মজুমদার / ওগো মাসি তুমি কার?"৮

অথবা

"আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে / ঢাল মৃগেল ঘাগর বাজে।"[৯]

এই শব্দগুলো কোনো অভিধানে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এদের উচ্চারণরীতি এক ধরণের সম্মোহনী আবেশ তৈরি করে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, এই অর্থহীন ধ্বনিগুলোর ভেতরেই লুকিয়ে থাকে প্রাচীন কোনো যুদ্ধের দামামা অথবা কোনো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সংকেত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গিতে, ছড়া হলো আমাদের সেই 'বিস্মৃত শৈশব' যা বড় হওয়ার পর আমরা হারিয়ে ফেলি। বেদের মতো ছড়াও

মানুষের শুদ্ধতম ও আদিমতম উচ্চারণ। এর প্রতিটি ছত্রে যে প্রত্ন-চেতনা কাজ করে, তা প্রমাণ করে যে বাঙালি জাতি তার প্রকৃতির সাথে নাড়ির টান কখনও ছিন্ন করেনি। ছড়াগুলো তাই নিছক ছেলেভুলানো গান নয়, বরং এক প্রাচীন জীবনের মহাকাব্যিক সারসংক্ষেপ।

প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসাহিত্যকে দেখেছেন সমাজের 'জীবন্ত ফসিল' হিসেবে। তাঁর মতে, সমাজ যখন স্থির থাকে না, তখন তার প্রতিটি কম্পন, প্রতিটি পরিবর্তন অলক্ষ্যে মুদ্রণ হয়ে যায় লোকছড়ার পঙ্‌ক্তিতে। এখানে আমরা দেখবো, কীভাবে বাংলার লোকছড়া কোনো শুষ্ক ইতিহাসগ্রন্থের চেয়েও অনেক বেশি বিশ্বস্তভাবে আমাদের সমাজ-বিবর্তনের পদচিহ্নগুলো ধারণ করে রেখেছে। বাংলার ইতিহাসে বর্গী আক্রমণ বা মারাঠা দস্যুদের লুটতরাজ এক বীভৎস অধ্যায়। কোনো রাজকীয় নথি যা প্রকাশ করতে পারেনি, বাংলার মায়েরা তাঁদের সন্তানদের ঘুম পাড়ানোর ছড়ায় সেই আতঙ্ককে চিরস্থায়ী করে রেখেছেন।

> "খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে / বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে?"[১০]

এটি কেবল একটি নিছক ঘুমপাড়ানি গান নয়; এটি আঠারো শতকের বাংলার এক চরম সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের দলিল। 'বর্গী' এখানে লুণ্ঠনকারী শক্তির প্রতীক এবং 'খাজনা' হলো সাধারণ কৃষকের ওপর রাষ্ট্রীয় শোষণের খড়্গ। এই একটি ছড়া প্রমাণ করে, কীভাবে বাঙালির পারিবারিক শান্তি (খোকার ঘুম) বহিরাগত আক্রমণে বিঘ্নিত হয়েছিল।

> "নীল বাঁদরের দল, তোরা সব পালাবি কোথায় বল?"[১১]

উনিশ শতকের নীল বিদ্রোহের স্মৃতিবাহী এই ছড়াটি শোষিত মানুষের সংক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এখানে 'নীল বাঁদর' বলতে নীলকুঠির অত্যাচারী সাহেবদের ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমাজ-বিবর্তনের ধারায় এটি একটি প্রতিবাদী সাহিত্যের প্রাথমিক রূপ।

বাংলার কৃষিভিত্তিক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন পেশার মানুষের যে অবস্থান ছিল, ছড়াতে তার নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়।

> "তাতীর বাড়ির ব্যাঙের বাসা কোলাব্যাঙের ছা / খাঁচায় বসে মিঞাসাহেব ধরেন পুঁটি মাছ।"[১২]

এখানে 'তাতী' এবং 'মিঞাসাহেব'— দুটো ভিন্ন সামাজিক ও পেশাগত স্তরের উল্লেখ রয়েছে। তন্তুবায়দের অবক্ষয়িত জীবনের বিপরীতে উচ্চবিত্তের যে অলস জীবনচর্যা, তা বিদ্রূপাত্মকভাবে ফুটে উঠেছে। এটি গ্রামীণ বাংলার পেশাভিত্তিক সমাজ-বিবর্তনের চিত্র।

"খোকা গেছে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে/ছিপ নিয়ে গেল কোলাব্যাঙে মাছ নিয়ে গেল চিলে।" [১৩]

এটি পল্লী বাংলার এক শান্ত অথচ অভাবী জীবনের প্রতিচ্ছবি। নদীর কূলে মাছ ধরা ছিল প্রাত্যহিক জীবিকা। কিন্তু সেই সংগৃহীত সম্পদও যখন প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম শক্তির (চিল বা ব্যাঙ) দ্বারা হরণ করা হয়, তখন তা লৌকিক জীবনের অনিশ্চয়তাকেই তুলে ধরে।

ব্রিটিশ শাসন বাংলার গ্রামীণ সমাজকে আমূল বদলে দিয়েছিল। নতুন শিক্ষা, নতুন পেশা এবং বিলেতি অনুষঙ্গগুলো কীভাবে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ছড়ায় মিশে গিয়েছিল, তা অত্যন্ত কৌতূহল উদ্দীপক।

> "সাহেব গেছে শিকারে, মেম গেছে বাজারে / খোকা গেছে পাঠশালে, কলম আছে পকেটে।"[১৪]

এখানে 'সাহেব', 'মেম', 'বাজার' এবং 'পকেট'— শব্দগুলো লক্ষণীয়। এই ছড়াটি প্রমাণ করে যে, বাংলার গ্রামীণ মানস ব্রিটিশ জীবনযাত্রার সাথে অভ্যস্ত হতে শুরু করেছিল। সমাজ যে সনাতন যুগ থেকে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার দিকে বিবর্তিত হচ্ছে, তার স্পষ্ট সাক্ষ্য এই পঙ্‌ক্তিগুলো।

"রেলগাড়ি ঝকঝক, মা আমায় দাও না বক / বাবুরা যায় সওদাগরি, আমরা কেন চাষা?"[১৫]

রেলগাড়ি বা আধুনিক প্রযুক্তির প্রবেশ বাঙালির মনে যে বিস্ময় এবং একইসাথে বৈষম্যের বোধ তৈরি করেছিল, তা এখানে স্পষ্ট। 'বাবু' ও 'চাষা'র এই বিভাজনটি শিল্প বিপ্লব উত্তর সমাজ-বিবর্তনেরই এক লৌকিক দলিল।

আশুতোষ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, ছড়া হলো পারিবারিক বিবর্তনের ইতিহাস। বিশেষ করে যৌথ পরিবারের ভাঙন বা পারিবারিক সম্পর্কে নারীর অবস্থান এখানে অত্যন্ত প্রখর।

"বড় বৌ গো বড় বৌ, বড় ঘরের গিন্নী / কাল আসব পরশু আসব, খেতে দিও সিন্নি।"[১৬]

অথবা

"ছেলে গেছে বাণিজ্যে, ভাই গেছে বন / মা গেছে রান্নাবাড়িতে, খেতে কতক্ষণ?"[১৭]

এই ছড়াগুলো পুরুষদের জীবিকার তাগিদে বাইরে যাওয়া এবং অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের গৃহস্থালি শ্রমের এক নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক চালচিত্র প্রদান করে। নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অভিমান এখানে সজীব হয়ে আছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মূল্যায়নে, লোকছড়া হলো ইতিহাসের এক অলিখিত রূপ। রাজা-বাদশাহদের কাহিনী ইতিহাসে ঠাঁই পেলেও সাধারণ মানুষের সংগ্রাম, তাদের বিবর্তন এবং প্রাত্যহিক যন্ত্রণার কথা ছড়াগুলোই পরম মমতায় রক্ষা করেছে। তাই ছড়া বাঙালির কাছে কেবল কাব্যের আমোদ নয়, বরং সমাজ-বিবর্তনের এক অব্যর্থ প্রামাণ্য ইতিহাস।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে লোকছড়া হলো একটি জনগোষ্ঠীর 'সাংস্কৃতিক সংকেত' বা Cultural Code। প্রখ্যাত সংগ্রাহক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তর ঘুরে যে সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ছড়ার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে বাঙালির আদিম টোটেম, ট্যাবু এবং লৌকিক আচারের এক প্রামাণ্য রূপরেখা বিদ্যমান। তা আমরা দেখবো যে, কীভাবে ছড়াগুলো বাঙালির গোষ্ঠীগত পরিচয় ও বিশ্বাসের নৃতাত্ত্বিক দলিল হয়ে উঠেছে। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, আদিম মানুষ যখন নিজেকে প্রকৃতির বিশালতায় অসহায় মনে করতো, তখন সে বন্য পরিবেশ বা মহাজাগতিক বস্তুর সাথে কাল্পনিক আত্মীয়তা স্থাপন করে নিরাপত্তা খুঁজতো। দক্ষিণারঞ্জন বাবুর সংগৃহীত ছড়াগুলোতে এই আত্মীয়করণের প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্ট।

"চাঁদ মামা চাঁদ মামা কপালে টিপ দিয়ে যা / চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।"[১৮]

এখানে চাঁদকে 'মামা' হিসেবে সম্বোধন করা কেবল মধুর সম্বোধন নয়, বরং এটি একটি নৃতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। চাঁদকে পরিবারের সদস্য করে নেওয়ার মাধ্যমে আদিম মানুষ মহাকাশের প্রতি তার ভয়কে ভালোবাসায় রূপান্তর করেছিল। কপালে 'টিপ' দেওয়ার আচারটি আসলে এক ধরণের 'প্রটেক্টিভ ম্যাজিক' বা সুরক্ষামূলক জাদু, যা শিশুকে অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করে বলে বিশ্বাস করা হতো।

"ওরে বক ওরে বক, আমায় একটা পান দে /
চুনা দিয়ে খাই না, সুপারি দিয়ে খাই না, খয়ের দিয়ে খাই না— /
এমনি পানটা দে।"[১৯]

পাখির সাথে এই কথোপকথন প্রমাণ করে যে, আদিম বাঙালির কাছে পশু-পাখি ও মানুষের মধ্যে কোনো দুর্ভেদ্য প্রাচীর ছিল না। এটি 'অ্যানিমিজম' বা সর্বপ্রাণবাদের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যেখানে প্রতিটি প্রাণের সাথে গোষ্ঠীগত লেনদেনের সম্পর্ক বিদ্যমান।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংকলনে 'শিব' বা 'লক্ষ্মী'র মতো পৌরাণিক চরিত্ররা শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্য হারিয়ে রক্ত-মাংসের লৌকিক মানুষে পরিণত হয়েছে। এটি ধর্মের নৃতাত্ত্বিক বিবর্তনের এক অনন্য দিক।

"শিব ঠাকুর এলেন দেশে, পাড়াপড়শি দেখে হাসে / শিবের মাথায় জটাভার, গলায় দোলে হাড়ের হার।"[২০]

এখানে শিব কোনো সংহারকর্তা ঈশ্বর নন, বরং তিনি গ্রামের একজন অতি পরিচিত, কিছুটা অদ্ভুত দর্শন প্রতিবেশীর মতো। উচ্চতর বৈদিক দেবতাকে লৌকিক স্তরে নামিয়ে এনে আপন করে নেওয়ার এই যে প্রক্রিয়া, তাকে নৃতত্ত্বের ভাষায় বলা হয় 'প্যারোকিয়ালাইজেশন'।

"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান / শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান।"[২১]

এই অতি পরিচিত ছড়াটির গভীরে লুকিয়ে আছে প্রাচীন সমাজের বহুবিবাহ প্রথা এবং কুলীনতন্ত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস। 'তিন কন্যে দান' করার বিষয়টি তৎকালীন সমাজকাঠামোর এক কঠিন বাস্তবতাকে তুলে ধরে, যেখানে বিবাহের মতো ধর্মীয় সংস্কারও লৌকিক প্রথার অধীন ছিল।

ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলো কেবল গান নয়, এগুলো এক ধরণের লৌকিক মন্ত্র, যা শিশুকে এক অলৌকিক জগতের আশ্রয়ে নিয়ে যায়।

"ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি এসো / খাট নেই পালঙ্ক নেই চোখের পাতায় বোসো।"[২২]

এখানে 'মাসিপিসি' কোনো রক্ত-মাংসের আত্মীয় নন, বরং তাঁরা হলেন নিদ্রার লৌকিক অধিষ্ঠাত্রী দেবী। খাট বা পালঙ্ক ছেড়ে চোখের পাতায় বসার যে আহ্বান, তা আসলে এক ধরণের সম্মোহনী আচার বা Hypnotic Ritual, যা শিশুকে মানসিক নিরাপত্তা প্রদান করে।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে ছড়াগুলো অনেক সময় অলিখিত আইন বা সামাজিক নিষেধাজ্ঞার বাহক হিসেবে কাজ করে।

"হাঁচি দিলে সোনা হয়, কাশি দিলে হীরা / অশুভ সব দূরে যাক, মাথায় রাখো গিরা।"২৩

অথবা

"সন্ধ্যাবেলায় নামতে নেই, গাছের তলায় যেতে নেই / ব্রহ্মদৈত্য ধরবে ঘাড়ে, নিস্তার কি আছে রে?"[২৪]

এখানে অশুভ শক্তি বা ব্রহ্মদৈত্যের ভয় দেখানোর মাধ্যমে শিশুকে সন্ধ্যার পর বাইরে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে। এই যে 'ট্যাবু' বা নিষেধাজ্ঞাগুলো ছড়ার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়, তা আদতে একটি জনগোষ্ঠীর শৃঙ্খলা রক্ষার আদিম পদ্ধতি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংগৃহীত উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ছড়া বাঙালির 'লৌকিক দর্শন'-এর এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। বেদের মন্ত্র যেমন আর্যদের আচার-অনুষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করতো, বাংলার লোকছড়াও তেমনি বাঙালির লৌকিক সংস্কার, জাদুকরী বিশ্বাস এবং আত্মীয়তার বন্ধনকে হাজার বছর ধরে আগলে রেখেছে। তাই ছড়া কেবল শৈশবের স্মৃতি নয়, এটি আমাদের নৃতাত্ত্বিক অস্তিত্বের এক জীবন্ত শেকড়।

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে লোকছড়া হলো বাংলার এক অনন্য ধ্বনি-সম্পদ। বেদের মন্ত্র যেমন তার নির্দিষ্ট ছন্দ ও উচ্চারণের শুদ্ধতার ওপর নির্ভর করে টিকে আছে, বাংলার লোকছড়াও তেমনি তার 'স্বরবৃত্ত' বা 'লৌকিক দলবৃত্ত' ছন্দের হিল্লোলে মানুষের স্মৃতিতে অমলিন হয়ে রয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো, ছড়ার ভাষাগত কাঠামো কীভাবে অর্থকে ছাপিয়ে এক ঐন্দ্রজালিক ধ্বনি-পরিবেশ তৈরি করে, যা একে 'লৌকিক বেদ'-এর মর্যাদা দেয়। বাংলার ছড়ার মূল প্রাণ হলো চার মাত্রার 'স্বরবৃত্ত' ছন্দ। এর চলন অত্যন্ত

দ্রুত এবং ঝংকারময়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লক্ষ্য করেছিলেন যে, এই ছন্দের মধ্যে এক ধরণের সহজ প্রাণশক্তি আছে যা কৃত্রিম কাব্যভাষার ধরাছোঁয়ার বাইরে।

"তাতীর বাড়ির ব্যাঙের বাসা কোলাব্যাঙের ছা / খাঁচায় বসে মিঞাসাহেব ধরেন পুঁটি মাছ।"[২৫]

এখানে প্রতি চার মাত্রা অন্তর একটি প্রশ্বাস বা বিরতি কাজ করে। এই ছন্দের গতিবিধি বেদের 'গায়ত্রী' বা 'ত্রিষ্টুভ' ছন্দের মতো গাণিতিক না হলেও, এর শ্রবণসুখদ আবহ মানুষকে একধরণের মানসিক প্রশান্তি দেয়। এই দ্রুত লয়ই ছড়াকে কানে শোনার সাথে সাথে হৃদয়ে গেঁথে দেয়।

অনেক ছড়ার মধ্যে এমন কিছু শব্দ থাকে যার আক্ষরিক কোনো অর্থ নেই, কিন্তু তার ধ্বনিগত প্রভাব অত্যন্ত গভীর। বেদের অনেক মন্ত্রে যেমন 'বীজ মন্ত্র' (যেমন— ওঁ, হ্রীঁ, ক্লীঁ) থাকে যার নির্দিষ্ট পার্থিব অর্থ না থাকলেও এক ধরণের আধ্যাত্মিক আবহ থাকে, ছড়াতেও অনুরুপ শব্দবিন্যাস পাওয়া যায়।

"ইকির মিকির চাম চিকির / চামের কাটা মজুমদার / ওগো মাসি তুমি কার?"[২৬]

অথবা

"আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে / ঢাল মৃগেল ঘাগর বাজে।"[২৭]

'ইকির মিকির' বা 'আগডুম বাগডুম' শব্দগুলোর কোনো অভিধানিক অর্থ নেই। কিন্তু এগুলোর পুনরাবৃত্তি এবং ধ্বনি-ব্যঞ্জনা এক ধরণের সম্মোহন (Hypnotism) তৈরি করে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, এই শব্দগুলো আসলে ইতিহাসের ধ্বনি-সংকেত যা কালের বিবর্তনে অর্থ হারিয়ে এখন কেবল সুরে টিকে আছে।

বেদের মন্ত্রে যেমন প্রকৃতির মহিমা বর্ণনায় শক্তিশালী চিত্রকল্প ব্যবহার করা হতো, লোকছড়াও অতি সাধারণ ভাষায় গভীর দৃশ্যকল্প তৈরি করতে পারে।

"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান / শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান।"[২৮]

'টাপুর টুপুর'— এই ধ্বন্যাত্মক শব্দটি কেবল বৃষ্টির শব্দ নয়, এটি এক ধরণের অনুভূতির প্রকাশ। লোকছড়ার ভাষা এখানে শব্দের সীমানা ছাড়িয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ লাভ করে। এই ভাষাগত সারল্যই একে আপামর জনসাধারণের কাছে 'শ্রুতি' হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।

মৌখিক সাহিত্যে কোনো তথ্যকে মনে রাখার জন্য শব্দের পুনরাবৃত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। বেদের পঠন পদ্ধতিতে (যেমন—জটা পাঠ, ঘন পাঠ) যেমন শব্দের বিন্যাস পাল্টে মনে রাখার কৌশল নেওয়া হতো, ছড়াতেও সেই একই কৌশল দেখা যায়।

"তাই তাই তাই, মামার বাড়ি যাই / মামার বাড়ি ভারী মজা, কিল চড় নাই।"২৯

বা

"হাট্টিমা টিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম..."[৩০]

এই 'তাই তাই' বা 'টিম টিম'— শব্দের দ্বিত্ব ব্যবহার শিশুদের স্মৃতিতে শব্দগুলোকে স্থায়ীভাবে গেঁথে দেয়। এটি ভাষাতাত্ত্বিকভাবে একটি অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি যা সহস্র বছর ধরে ছড়াকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে লোকছড়া বাংলার এক সমৃদ্ধ সম্পদ। এর ছন্দ কেবল মাত্রার হিসাব নয়, বরং এটি বাঙালির হৃদস্পন্দনের এক কাব্যিক রূপ। বেদের মন্ত্র যেমন ধ্বনির মাধ্যমে ব্রহ্মের উপাসনা করে, বাংলার লোকছড়াও তেমনি তার অনবদ্য ছন্দ ও লয়ের মাধ্যমে বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের আনন্দ-বেদনাকে অবিনাশী রূপ দান করে। এর ভাষাগত দৃঢ়তা ও ধ্বনিগত জাদুই একে আধুনিক সাহিত্যের ভিড়েও এক শাশ্বত 'লৌকিক বেদ' হিসেবে টিকিয়ে রেখেছে।

বাংলার লোকছড়াকে যদি আমরা 'লৌকিক বেদ' হিসেবে গণ্য করি, তবে সেই বেদের প্রধান হোতা বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হলেন বাংলার নারীসমাজ। ঠাকুরমা, দিদিমা এবং অন্তঃপুরবাসিনী মায়েদের কণ্ঠেই এই বাচিক ঐতিহ্য হাজার বছর ধরে সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতা এবং ডিজিটাল বিপ্লবের অভিঘাতে এই প্রাচীন শিল্পকলা আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। লোকছড়ার একটি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে নারীর নিজস্ব পৃথিবী। যেখানে প্রথাগত ইতিহাসে নারীর কথা উপেক্ষিত হয়েছে, সেখানে ছড়া হয়ে উঠেছে তাদের আনন্দ, বেদনা, ঈর্ষা এবং প্রতিবাদের গোপন দলিল।

> "বড় বৌ গো বড় বৌ, বড় ঘরের গিন্নী / কাল আসব পরশু আসব, খেতে দিও সিন্নি।"[৩১]

এখানে বড় বৌয়ের যে কর্তৃত্ব এবং একইসাথে তার প্রতি পরিবারের অন্যান্যদের যে প্রত্যাশা—তা মধ্যযুগের বা বাংলার সনাতন যৌথ পরিবারের অভ্যন্তরীণ রসায়নকে তুলে ধরে।

> "বর আসছে পাল্কি চড়ে, কনে কাঁদে আড়ালে / বাপের বাড়ি ছেড়ে যাবে, সোনার কলস ফেলে।"[৩২]

এটি কেবল বিয়ের ছড়া নয়, বরং পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় নারীর শিকড়চ্ছিন্ন হওয়ার যে গভীর যন্ত্রণা, তার এক নৃ-তাত্ত্বিক বিলাপ। বেদে যেমন 'বিবাহ সূক্ত' রয়েছে, বাঙালির এই ছড়াগুলো হলো নারীর জন্য সেই বেদনার ভাষ্য।

> "হাতে টিপ পায়ে টিপ, সোনার টিপ সোনার রূপ / শাশুড়ি গেল ঝগড়া করতে, বৌ গেল দিতে ধূপ।"[৩৩]

এখানে শাশুড়ির ক্রোধ এবং বৌয়ের ভক্তি বা ধৈর্য— দুটো বিপরীতমুখী চরিত্রকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এটি তৎকালীন নারীর ঘরোয়া সংগ্রামের এক সূক্ষ্ম সামাজিক দলিল।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ছড়া তার 'মৌখিকতা' বা 'শ্রুতি'র চরিত্র হারাচ্ছে। আমরা যখন ছড়াকে বেদের সাথে তুলনা করি, তখন তার 'এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হওয়ার' বিষয়টিই মুখ্য। কিন্তু আধুনিক জীবনযাপন এই নিরবচ্ছিন্ন ধারাকে বাধাগ্রস্ত করছে। বর্তমানে মায়েদের মুখনিঃসৃত ছড়ার স্থান দখল করেছে ইউটিউব কার্টুন বা রাইমস্। এতে ছড়ার সুর ও তালের সেই লৌকিক স্পন্দনটি হারিয়ে যাচ্ছে। যান্ত্রিক সুরের ছড়া আর মানুষের আবেগমাখা কণ্ঠের ছড়ার মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক ফারাক, তা শিশুর বিকাশকেও প্রভাবিত করছে। ছড়া টিকে ছিল ঠাকুরমা-দিদিমাদের সান্নিধ্যে। বর্তমানের একক পরিবার ব্যবস্থায় সেই বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুপস্থিতি ছড়া বলার সংস্কৃতিকে স্তিমিত করে দিয়েছে। ফলে 'লৌকিক বেদ' আজ কেবল মুদ্রিত বইয়ের পাতায় বন্দী হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আঞ্চলিক শব্দের বদলে প্রমিত বা বিদেশি ভাষার আধিক্য লোকছড়ার সেই সোঁদা মাটির গন্ধ বা 'এথনিক এসেন্স' কেড়ে নিচ্ছে। *'ইকির মিকির'* বা *'আগডুম বাগডুম'*- এর মতো ধ্বনিগুলো আধুনিক শিশুদের কাছে কেবল অর্থহীন কোলাহল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নারীর কণ্ঠস্বরই ছিল লোকছড়ার প্রাণভ্রমরা। তাদের জীবনবোধ, শাসন, মমতা এবং লোক-সংস্কার থেকেই এই ছড়াগুলোর জন্ম। কিন্তু আধুনিকতা এবং ডিজিটাল মিডিয়ার প্রসারে এই 'শ্রুতি' ঐতিহ্যের শিকড় আজ নড়বড়ে। তবে আশার কথা এই যে, বিশ্বজুড়ে এখন আবার 'ফোক-রিভাইভাল' বা লোক-পুনর্জাগরণের কাজ শুরু হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে এই লৌকিক সম্পদকে পুনরায় মানুষের মগজ ও হৃদয়ে ফিরিয়ে আনাই বর্তমান সময়ের প্রধান দাবি।

বাংলার লোকছড়া নিয়ে আমাদের এই দীর্ঘ পথচলা শেষে একটি সত্য অত্যন্ত প্রখরভাবে প্রতিভাত হয়— ছড়া কেবল শৈশবের খেলার অনুষঙ্গ নয়, বরং এটি বাঙালির অস্তিত্বের এক গভীরতম শেকড়। আমরা একে 'লৌকিক বেদ' বলে অভিহিত করেছি কারণ বেদের মতোই ছড়া তার 'শ্রুতি' ও 'স্মৃতি'র মাধ্যমে

একটি জাতির আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তনকে বহন করে এনেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের মতো মনীষীরা আমাদের শিখিয়েছেন যে, ছড়ার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে লুকিয়ে আছে এক একটি প্রত্ন-আখ্যান। আমাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি, কীভাবে ছড়া তার শরীরের পরতে পরতে আদিম প্রত্ন-চেতনাকে ধরে রেখেছে। প্রকৃতির প্রতিটি স্পন্দনকে আত্মীয় করে নেওয়ার যে আরণ্যক দর্শন বেদে পাওয়া যায়, বাঙালির 'চাঁদ মামা' কিংবা 'বৃষ্টি আবাহনের' ছড়াতেও সেই একই বিশ্বজনীন সুর ধ্বনিত হয়। আবার সমাজ-বিবর্তনের ধারায় বর্গী আক্রমণ থেকে শুরু করে নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচার পর্যন্ত— বাংলার ইতিহাসের কোনো সংকটই ছড়ার অমোঘ দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। নৃতাত্ত্বিক বিচারে ছড়া যেমন আমাদের লৌকিক আচারের দর্পণ, ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে তেমনি এটি আমাদের স্বরবৃত্ত ছন্দের এক ঐন্দ্রজালিক ধ্বনি-সম্পদ। তবে বর্তমানে আমরা এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের জোয়ারে আমাদের এই বাচিক ঐতিহ্য আজ অনেকটা কোণঠাসা। একক পরিবারের বিস্তার এবং ডিজিটাল বিনোদনের আধিপত্যের কারণে মা-ঠাকুমার মুখনিঃসৃত সেই 'লৌকিক বেদ' আজ কেবল গবেষণার বিষয় বা মুদ্রিত বইয়ের পাঠ্য হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, ছড়া কেবল শব্দ নয়, এটি একটি জীবন্ত অভিজ্ঞতা। এই ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়া মানে বাঙালির সেই সহস্র বছরের সামষ্টিক অবচেতনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া, যা তাকে বিশ্বের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে আলাদা ও অনন্য করে তুলেছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলার লোকছড়া আমাদের সেই হারানো দিনলিপি, যা আধুনিকতার প্রখর আলোতেও তার নিজস্ব রহস্য ও মায়া বজায় রেখেছে। এই 'লৌকিক বেদ' আমাদের শেখায় কীভাবে অভাবের মধ্যেও আনন্দ খুঁজে নিতে হয়, কীভাবে প্রকৃতিকে আপন করতে হয় এবং কীভাবে প্রতিকূল ইতিহাসের মাঝেও সুরের ঝংকারে টিকে থাকতে হয়। আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার আঙিনায় বাংলার এই ছড়া-সম্পদকে প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ হলো বাঙালির সেই আদিম ও অকৃত্রিম কণ্ঠস্বরকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা। ছড়া বেঁচে থাকুক আমাদের রক্তে, আমাদের স্মৃতিতে এবং আমাদের ভবিষ্যতের উত্তরসূরিদের কলকাকলিতে— কারণ ছড়া বেঁচে থাকলেই বেঁচে থাকবে বাংলার প্রাণস্পন্দন।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা: ১৭।
২। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ১৫২।
৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শিশু। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯০৩। পৃষ্ঠা: ১১।
৪। মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন। ঠাকুরমার ঝুলি। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০২ (পুনর্মুদ্রণ)। পৃষ্ঠা: ৫২।
৫। মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন। ঠাকুরমার ঝুলি। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০২ (পুনর্মুদ্রণ)। পৃষ্ঠা: ৫৩।
৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা: ২৩।
৭। মজুমদার, রোকেয়া খাতুন। ছোটদের ছড়া ও কবিতা। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮। পৃষ্ঠা: ৪২।
৮। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ১৬৪।

৯। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ১৮২।
১০। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ১৩৪।
১১। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ১৪৮।
১২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা: ২৬।
১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা: ২৮।
১৪। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ১৫৯।
১৫। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ১৬৮।
১৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা: ৩০।
১৭। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ১৫৫।
১৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা: ৩৬।
১৯। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ১৭২।
২০। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ১৯২।
২১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা: ১৭।
২২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা: ৩৯।
২৩। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ২০৪।
২৪। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ২১০।
২৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা: ২৬।
২৬। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ১৬৪।
২৭। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ১০৮।
২৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা: ১৭।
২৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা: ৪২।
৩০। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ২১৫।
৩১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা: ৩০।

৩২। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ১৮৮।

৩৩। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃষ্ঠা: ১৫২।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ইসলাম, মাজহারুল। ফোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪।

২. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। লোকসংস্কৃতি সঙ্কলন ও বিশ্লেষণ। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮২।

৩. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত)। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটরস, ১৯৯৫।

৪. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার। কলকাতা: অমর ভারতী, ১৯৭৪।

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯০৫।

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। লোকসাহিত্য। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯০৭।

৭. দাস, নির্মল। বাংলা ছড়ার ভূমিকা। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৮।

৮. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড: ছড়া)। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৪।

৯. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোকসংস্কৃতি। নয়া দিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭০।

১০. ভট্টাচার্য, সুধীরঞ্জন। বাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি। কলকাতা: মণ্ডল বুক স্টল, ১৯৬৮।

১১. মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন। ঠাকুরমার ঝুলি। কলকাতা: ভট্টাচার্য অ্যান্ড সন্স, ১৯০৭।

১২. মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু। বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০।

১৩. শরীফ, আহমদ। বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশনস, ১৯৭৮।

১৪. সেন, দীনেশচন্দ্র। লোকসাহিত্য। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৪।